রংদার রোববার

স্বল্প গল্প

টিকটিকি

কালিদাস দাস

টিকটিকিগুলোর স্বাস্থ্য এত খারাপ হয়ে গেল কেন? কী ব্যাপার! এ বাবা! এই টিকটিকির লেজ খসল কীভাবে? ইসস, টিকটিকিগুলো বোধহয় খুব কষ্টে আছে!—সদ্য ওয়ালপুট্টির পরত চাপানো দেওয়ালে হেঁটেচলে বেড়ানো একজোড়া টিকটিকির দিকে তাকিয়ে গভীর আক্ষেপের সুরে পর পর প্রশ্নগুলো করলেন শুভময়। তবে প্রশ্নগুলো ঠিক কাকে উদ্দেশ্য করে, তা বোঝা গেল না! শুভময়ের তাকানোর ভঙ্গির মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকত্ব আর শিশুসুলভ কৌতূহলী মনের অপরিমেয় জিজ্ঞাসার সংমিশ্রণ। তাঁর চোখের তারার মধ্যে এক অদ্ভুত নাচন চলছে অবিরত। অস্থির তারাদুটো কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে! অনেকটা কাছাকাছি চলে আসা ভ্রু'দুটির মাঝে থাকা কোঁচকানো চামড়ায় কিছু চিন্তাতরঙ্গের আনাগোনা চলছে হরদম।

আপনার চা... খেয়ে নিন। ঠান্ডা হয়ে যাবে।

নিস্তেজ গলায় বলে ওঠেন সুতপা। এতক্ষণ তিনি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন নীরবে। চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিলেন যন্ত্রবৎ। মনে মনে ভাবলেন, যে দেশে আজও বহু মানুষ অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটায়, যে দেশে আজও জনস্বাস্থ্য বলতে পরিষেবাহীন কংকালসার হাসপাতালে গোরু-ছাগলের মতো গুঁতোগুঁতি করে ডাক্তার দেখাতে হয় এবং চারটে সস্তা অকেজো ওষুধ দিয়েই সরকার বাহাদুর হাসিমুখে দায় সারে, সে দেশে টিকটিকির স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবাটা নিছক অ্যাবসার্ড কল্পনা বিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তিনি নিরুত্তর রইলেন।

হ্যাঁ, কী! আ...আমার চা! চা-ই তা?—ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন শুভময়। সুতপা চোখের ইশারায় ভরসা জোগালেন।

বাইরের আকাশে তখন সকালের প্রথম আলোককণা কাতারে কাতারে ছুটে আসছে অনর্গল। সদ্য ভাঙা ডিম থেকে যেমন বেরিয়ে আসে হলুদ কুসুম ও জলীয় অংশ তেমনই গোটা আকাশ জুড়ে কুসুমসদৃশ সূর্য আর আলোর বন্যা।

কেটলিতে থাকা তলানি চা-টুকু ছেঁকে কাপে ঢাললেন সুতপা। বাঁ হাত দিয়ে গতকালের বাসি সংবাদপত্রের পাতা ওলটাতে ওলটাতে তৃপ্তিসূচক টান দেন চায়ে।

এ লা ননিতা নানাননিতা এলা, ননিতা এলাবেনদি সিএআ, বেনদি সিএআ—অ্যাকস্টিক গিটারে সুর তুলে গুনগুনিয়ে গাইছে ঋতময়। তার গলায় অসন্তুষ্টির চাপা ক্ষোভ। গিটারে টিউনিং কি গুলোকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিখুঁত করে তোলার চেষ্টায় মগ্ন। কিছুতেই এই বিখ্যাত স্প্যানিশ গানটা তুলতে পারছে না। সামনেই কলেজের সোশ্যাল। এ বছরই তার লাস্ট ইয়ার। এই গানটাই সে গাইবে সোশ্যালে, তাই যেভাবেই হোক গানটা তাকে তুলতেই হবে। নইলে মান থাকবে না। অন্তত বান্ধবী রুচিরাকে মুগ্ধ করার জন্য এ গান তাকে রেডি করতেই হবে।

এখন নভেম্বরের শেষ। অথচ এখনও ঠান্ডা পড়েনি ঠিক মতো। এখনও ভোরের দিকে কুয়াশা জমে না ফাঁকা রাস্তায়। কেমন যেন বদলে বদলে যাওয়া পৃথিবী! অবাক লাগে সুতপার। অথচ কিছু বছর আগেও নভেম্বরে জমাটি শীতের আসর বসত। বাঁকে করে নিয়ে আসা নতুন খেজুরের গুড় স্বাদ বদলের সাক্ষ্য থাকত। গুড়ের উপর যত রাজ্যের মাছির ভোঁ ভোঁ শব্দে যেন প্রাণ ফিরে পেত এ বোবা পৃথিবী।

বর্ধমানের প্রত্যন্ত গ্রামে বেড়ে ওঠা সুতপার বড় অদ্ভুত ঠেকে এই ইট, কাঠ, কংক্রিটের ফ্ল্যাটবাড়ি। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট যেন পরস্পর নাড়িছেঁড়া প্রবাসী আত্মীয়। একই ফ্ল্যাটে এতগুলো পরিবার অথচ কেউ কারো সঙ্গে সাবলীলভাবে কথা বলে না, কেউ কারো খোঁজ নেয় না বা নিলেও তাতে আন্তরিকতা, স্বতস্ফূর্ততার এতই অভাব যে, বড় কৃত্রিম বলে মনে হয় সুতপার। মানুষ তার প্রতিবেশী সম্পর্কে এতটা উদাসীন কীভাবে হয় কিংবা মানুষ নিজেকে নিয়েই বা কী এত ব্যস্ত থাকে তা সুতপা বোঝেন না!

সুতপা শুধু ভাবেন। ভাবনা-বিন্দুগুলো ক্রমশই জমাট বাঁধে তাঁর মনের ভিত্তিমূলে। ভাবেন — আধুনিকতার নামে মানুষের মধ্যে অমানবিকতা, ক্রূরতা, ঈর্ষা আর স্বার্থপরতার বীজ লালিত হচ্ছে তিল তিল করে। আধুনিক মানুষ দিনের শেষে চূড়ান্ত একাকীত্বে ভুগছে। আত্মকেন্দ্রিকতায় এতটাই মত্ত যে পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগৎকে মন দিয়ে দেখার ইচ্ছে বা তাগিদ কোনওটাই অনুভব করে না আধুনিক মানুষ।

ঋতময়ের মায়ের অকাল মৃত্যুর পর 'আম্রপালি এনক্লেভ'-এর থার্ড ফ্লোরে থ্রি বিএইচকে ফ্ল্যাটটি কেনেন তার পিতা শুভময় চট্টোপাধ্যায়। ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়ায় প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা দিয়ে এ ফ্ল্যাটটা কিনতে তেমন কোনও অসুবিধা হয়নি তাঁর। পিতা-পুত্রের সংসার একজন পরিচারিকার সহযোগিতায় ঠিক তালেই চলছিল। তবে তাল যে মাঝে মাঝে কাটত না, তা নয়! পিতা-পুত্রের মাঝে নানা বিষয় নিয়ে, যেমন— ছেলের রাত করে বাড়ি ফেরা, ইচ্ছেমতো টাকাপয়সা ওড়ানো, কুসঙ্গে জড়িয়ে পড়া কিংবা বাবার অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন, নিয়মিত মদ্যপান, অফিসের কলিগ মিসেস ঝুনঝুনওয়ালার সঙ্গে ফস্টিনস্টি ইত্যাদি নানা বিষয়ে ঝগড়া লেগে যেত। ঝগড়া এমন চরমে উঠত যে, ঋতময় তার একমাত্র মাসি সুতপার জামসেদপুরের বাড়িতে গিয়ে থাকত সপ্তাহখানেক। আবার সব মিটমাট হলে তবে পিতা-পুত্র এক সংসারে ফিরত। বিধবা মাসিও তার একমাত্র বোনপো-র আদর-যত্নে খামতি রাখত না। সুতপার একমাত্র ছেলে অরুণাভ পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়া শহরে পোস্টেড —ওখানকার নামকরা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। সেখানেই এক বিদেশিনীকে বিয়ে করে সেটলড হয়েছে। মায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে টেলিফোন, মোবাইলে।

কারা যেন আমায় মারতে আসছে! কালো কালো হুডে ঢাকা মাথা! রোদের ছোঁওয়ায় চকচক করছে ওদের অস্ত্র। বাঁচাও! বাঁচাও!—শুভময়ের চিৎকার শুনে ছুটে গেলেন সুতপা। চোখেমুখে আতঙ্ক মাখিয়ে বললেন—

জামাইদা কী হয়েছে? কারা আসছে? কোথায়? কই! কই!

সুতপাকে দেখে ঠোঁটের কোণে হাসি তুলে নিস্পৃহ গলায় শুভময় প্রশ্ন করলেন —কী হয়েছে সুতপা? তুমি এভাবে ছুটছ কেন? এ বাবা তুমি ঘুড়ি ধরবে? ওই দেখ পেটকাটিটা কেটে গেছে, ভো-কাট্টা! বাচ্চা ছেলেদের মতো হাততালি দিয়ে উঠলেন শুভময়। থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে সুতপা। দেখলেন, শুভময়ের ঠোঁটের দু-কোণে অনেকটা থুতু জমেছে। আজ ভোরে পিত্ত বমি করার সময়ও অনেকটা সবুজাভ থুতু বেরিয়েছিল।

চুপচাপ নিজের ঘরে এলেন সুতপা। জামাইবাবু অসুস্থ হওয়ার পর থেকেই তিনি এই ফ্ল্যাটে এসে থাকছেন। পিতা-পুত্রের সংসারে জোগান দিচ্ছেন হাসিমুখে। এতে অবশ্য যথেষ্ট খুশি সুতপা। দিদি বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁকে এতটা দায়ভার নিতে হত না। তবে দুঃখ একটাই, ঋতময়ের সঙ্গে তার বাবার সম্পর্কটা সহজ হল না মোটেও —জেনারেশন গ্যাপ বোধহয়! ঋতময় তার বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে মোটেও চিন্তিত নয়। সে আপন খেয়ালে স্প্যানিশ লোকসংগীত গাইছে। পারেও বটে!

এ শহরের বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট ড. মজুমদার অবশ্য বলেছেন—এ রোগে পেশেন্ট প্রচণ্ড বিষণ্ণতায় ভোগে, বেশিরভাগ সময়ই মনখারাপ করে বসে থাকে। আবার কখনও কখনও ম্যানিক কন্ডিশনে পৌঁছে যায় অর্থাৎ পেশেন্ট যখন তখন ক্ষেপে যায়, সবকিছুতেই অতি চঞ্চল হয়ে পড়ে। ডেইলি রুটিন ওয়ার্কগুলোও অ্যাকিউরেট পারফর্ম করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। অনেক সময় একই মানুষের মধ্যে দ্বৈত সত্ত্বা জেগে ওঠে। সুতপা জেনেছেন তাঁর জামাইবাবু একইসঙ্গে ধনী ও প্রতিপত্তিশালী মানুষ। সেই তিনি আজ 'বাইপোলার ডিসঅর্ডার' নামক এক কঠিন মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এ রোগের কারণ খুঁজতে যাওয়া তাঁর সাধ্যের বাইরে।

আজকের সকালটা বেশ মনোরম। চারিদিকে জমাট কুয়াশায় সবকিছু ঝাপসা দেখাচ্ছে। স্ট্রিট লাইটগুলো অনেক বেলা অবধি জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে পথচারীদের সুবিধার্থে। এই শেষ ক'দিন বেশ ঠান্ডা পড়েছে। তবে আজকের ঠান্ডার প্রাবল্য অনেক বেশি। কম্বলের তলায় শুয়ে টের পেলেন সুতপা। আলসেমি জড়ানো মনে তিনি ভাবছেন, আরো কিছুক্ষণ কাটিয়ে দেবেন কম্বলের তলায়, ভাবনার অতলে। কিন্তু না! তাঁর ভাবনার সুতোগুলো ছিঁড়ে গেল আচমকা!

গুড মর্নিং... হ্যাভ আ নাইস ডে... ইওর বেড-টি ইজ রেডি—একটা বড় কফি মগে চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঋতময়। ঠোঁটে হাসির ঝিলিক থাকলেও তা যে বড্ড মেকি, তা বুঝতে অসুবিধা হল না সুতপার।

তোমার বাবা কোথায়?—সুতপার প্রশ্নের উত্তরে ঋতময় চোখের ইশারায় তাঁকে পাশের ঘরে যেতে বলল।

পাশের ঘরে গিয়ে সুতপা দেখলেন আপাদমস্তক কম্বলমুড়ি দিয়ে বসে আছেন শুভময়। চোখের তলায় কালো দাগ। লাল টকটকে চোখ। হয় ভয়ানক কোনও স্বপ্ন দেখেছেন, নয় রাতভর ঘুমোননি। অবশ্য কোনও কারণ জানতে চাননি সুতপা। শুভময়ের কথাবার্তা বড্ড অগোছালো এবং মনগড়া। এই তো সেদিন, কনুই-এর তলায় কালসিটে দাগ দেখে শুভময়কে কারণ জানতে চাইলে জানান, ছেলে ঋতময় তাঁকে ড্রাম-এর স্টিক দিয়ে মেরেছে। পরে জানতে পারেন ডাহা মিথ্যে বলেছেন শুভময়, সম্ভবত বাথরুমের দরজায় লেগে এই দাগটা হয়েছিল।

তবে বিগত দশদিন ধরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে সুতপাও কেমন মনমরা। ফিলাডেলফিয়া থেকে তাঁর ছেলে ই-মেল করেছে। মাকে আর এ দেশে রাখতে চাইছে না। সে নিজেও বাবা হতে চলেছে। তাই মাকে সঙ্গে এনে ফিলাডেলফিয়াতেই রাখতে চায়। একজন চেনা এজেন্টের মাধ্যমে পাসপোর্ট, ভিসা বানিয়ে ফেলবে। জামসেদপুরের বাড়িটা বিক্রি করে মাকে নিয়ে পাকাপাকিভাবে ফিলাডেলফিয়াতেই থেকে যেতে চায় সে।

খবরটা শোনা ইস্তক শুভময় গুম মেরে বসে আছেন। কখনওবা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বলছেন—যা পড়ে গেল! টিকটিকিটা মেঝেতে পড়ে গেল! মরে গেল! মরে গেল! সত্যি বলতে কি, জামাইদার উপর একটা মায়া পড়ে গেছে সুতপার। ডা. মজুমদারের কথামতো এই অবস্থায় তাঁর পাশে থাকাটা খুবই জরুরি। কিন্তু সুতপা বুঝতে পারছেন না, তিনি এই অবস্থায় কোনদিকে যাবেন বা কী করবেন!

মাসদুয়েক পরের এক ঝিমধরা রোদহীন বিকেল। মাঝারি সাইজের একটা ট্রলি ব্যাগে অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র ভরে বিদেশযাত্রার জন্য প্রস্তুত সুতপা। শুভময়ের মানসিক স্বাস্থ্য অনেকটাই উন্নতির পথে। ঋতময়ও একটা প্রাইভেট ফার্মে শিক্ষানবিশি শুরু করেছে।

আপাতত মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে ঋতময়। শুভময় ধুলোর হালকা আস্তরণ পড়া দেওয়ালের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে। মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসু গলায় বলছেন — যেতেই হবে? যেতেই হবে! পরক্ষণেই করুণ সুরে— কেউ থাকে না! কেউ থাকে না!

চোখের কোণে জমে ওঠা অশ্রুবিন্দুগুলি শাড়ির খুঁটে মুছে নিয়ে ঝুল বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন সুতপা। সেখানে অনেকগুলো ঝুলন্ত টবে বেশকিছু ফুলগাছ তাঁরই যত্নে বেড়ে উঠেছে এতদিনে। গোলাপ গাছে ছোট্ট একটা কুঁড়ি। তীব্র আক্রোশে কুঁড়িটা ছিঁড়ে নীচের রাস্তায় ফেলে দিলেন সুতপা।

ট্যাক্সি রেডি — কান্না চাপা গলায় বলল ঋতময়। ব্যাগটা হাতে নিয়ে সে এগিয়ে গেল লিফটের দরজার দিকে। অরুণাভ দমদম বিমানবন্দরে নেমেই রিটার্ন ফ্লাইট ধরবে মাকে সঙ্গে নিয়ে। দমদম থেকে নিউইয়র্ক হয়ে সেখান থেকে ফিলাডেলফিয়া —সুতপার দীর্ঘ বিমান সফরের সঙ্গী কিছু অমলিন স্মৃতিরাশি, দেশের মাটির সোঁদা গন্ধের অন্তিম রেশটুকুই।

সুতপা ঋতময়কে সব বুঝিয়ে বলেছেন। ডা. মজুমদারের সঙ্গে পরামর্শ করে শুভময়কে আপাতত 'নিউ লাইফ অ্যাসাইলাম'-এ পাঠানোর বন্দোবস্ত করেছেন। মাস ছয়েকের মধ্যে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠবেন শুভময়— প্রত্যেকেই আশাবাদী। সুতপা সুযোগ পেলে মাঝে মাঝে দেখে যাবেন।

বাবা সুস্থ হয়ে উঠবে তো মাসি?—ভয়ার্ত স্বর ঋতময়ের।

উঠবেই — দৃঢ়তার সঙ্গে ভরসা জোগালেন সুতপা। ঠিক তখনই অপরিমাপ্য স্তব্ধতা ভেদ করে শোনা গেল ধুলো জমা দেওয়াল চষে ফেলা টিকটিকির মুখনির্গত 'ঠিক ঠিক ঠিক' ধ্বনি।

রম্যরচনা

অক্সিমিটার

সন্ধ্যা দত্ত

তা প্রায় মাসদুয়েক পরে দুর্গা নাম স্মরণ করে পথে বের হলেন দামোদর বাবু। একটু উকিঁঝুকি মেরে দেখলেন —নাহ্, রাস্তা বেশ ফাঁকা। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁটা দিলেন। কোথা থেকে হঠাৎ বাইকে দুই পুলিশ দামোদরবাবুর পথ আগলে দাঁড়াল—এই যে কাকু, মাস্ক কোথায়? দিন, ৫০০ টাকা ফাইন! নাকে হাত দিয়ে দেখলেন তিনি উন্মুক্ত। পকেট হাতড়ে বুঝলেন জামা বদল করেছেন।

—আচ্ছা বাবা, আমি এখনই কিনে নিচ্ছি।

—তা বল্লে তো হবে না কাকু। ফাইন আপনাকে দিতেই হবে। আর এই যে, আমাদের কাছে মাস্ক আছে, পরে নিন।

—না বাবা, অত টাকা তো নেই আমার কাছে!

—তাহলে একটা পাত্তি দিন, মানে ১০০ টাকা। ফাইন না দিলে আপনাদের শিক্ষা হবে না।

টাকা নিয়ে সাঁ করে বাইক চলে যায়। কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন দামোদরবাবু। ভাগ্যিস বুকপকেটে ১০০ টাকা আলাদা করে রাখা ছিল। মাসের ফর্দ আর ৫০০০ টাকা ঝোলা ব্যাগে রাখা আছে। ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেরা ক্ষেপাত—'দামোদর পাইন, দশ টাকা ফাইন।' সেটা যে আজ একশোয় ঠেকবে, কে জানত?

বেজার মুখে পা বাড়ান দামোদরবাবু। একি! পাড়ার ওষুধের দোকানে এত ভিড় কেন? ভোট তো কবে মিটে গেছে! কারো কিছু হল নাকি?

—কী হয়েছে ভাই?

—কী হয়নি বলুন? সেকেন্ড ওয়েভ শেষ হতে না হতেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, হোয়াইট ফাঙ্গাস উপরি পাওনা। তারপর আবার থার্ড ওয়েভের শমন শিয়রে। কাকু দেখি কিছুই খবর রাখেন না। সব ওয়েভের প্রোটেকশনের জন্য মাসকাবারির মতন এইসব নিচ্ছি। কিন্তু কাকু, আপনি তো ডাবল মাস্ক পরেননি?

কবে সচেতন হবেন, নিউজ দেখেন না নাকি?

দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখেন দামোদরবাবু। সকাল থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত টিভি গিন্নির দখলে। নিউজ দেখতে চাইলে বলে—ওসব মরার খবর আমি শুনতে চাই না। সারাদিন চলে কুঁচুটেপনা সিরিয়াল।

—এই যে শমিত, এই কাকুকে একটা মাস্ক দে। সিঙ্গল মাস্ক পরে আছে। ক্রেতা-বিক্রেতার ঠেলায় নাকে ডাবল মাস্ক বহাল তবিয়তে তার জায়গা করে নিল।

—কিন্তু দাম? আমি তো পয়সা দিইনি!

—সব কিনে একসঙ্গে দেবেন।

—সব কিনে মানে?

--বাঁচতে চাইলে এইসব কিনতে হবে। এই হাবলু, অক্সিমিটার আর পিপিই কিট দিয়েছিস তো মনে করে?

ট্যাক্সির মিটার, বাড়ির লাইটের মিটার দেখেছেন। কিন্তু অক্সিমিটার! এই প্রথম শুনলেন দামোদরবাবু।

—অক্সিমিটার! সেটা আবার কি!

--সে কি কাকু! এ জগতে আছেন তো আপনি? শরীরের অক্সিজেন মাপার যন্ত্র। অক্সিজেন লেভেল ৯২-এর নীচে নেমে গেলে সোজা হাসপাতালে যেতে হবে অক্সিজেন নিতে। এটা আপনার কাছে থাকলে আপনি নিশ্চিন্ত।

—না মানে, ঠিক কী কী লাগবে?

—এই যে হাবলু, আমার লিস্টটা কাকুকে দিলাম। দিয়ে দিস বুঝলি? লাইনে দাঁড়ান কাকু। কিছুক্ষণ পরে দেখবেন সব শেষ।

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন লাইনে। বেরোতে পারছেন না। কারণ, মাস্কের দাম দেওয়া বাকি!

—এই যে কাকু, ৪৬৮০ টাকা বিল হয়েছে। এই নিন আপনার ব্যাগ। কিন্তু পিপিই কিট তো ধরছে না কাকু। আপনি এটা পরে নিন।

—অ্যাঁ!! কি বলছ তুমি?

— দেখছেন না! ডাক্তাররা কি এমনি এমনি পরছেন?

—কিন্তু আমি তো ডাক্তার নই?

— দেখলেন না, আপনার সামনেই ভদ্রলোক কিনে নিলেন। যা হাবলু, কাকুকে এটা পরিয়ে দে।

—কিন্তু এত বড় ব্যাগে কী কী দিলে বাবা?

—দেখুন ওনার লিস্ট দেখে দিলাম। তাড়াতাড়ি বিল দিন। আপনার পিছনে অনেকেই দাঁড়িয়ে আছেন।

পিছনপানে তাকিয়ে দেখেন। সত্যিই পিছনে বড় লাইন। গোমড়ামুখে বিল মেটালেন। হাবলু তাকে পিপিই কিট পরিয়ে দেয়।

একবার টিভিতে দেখেছিলেন, চাঁদে নামলে যেমন লাগে তাঁকে যে সেইরকম লাগছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু তাঁর মাথায় উপরি পাওনা নিজের ছাতা। কি গেরোয় পড়া গেল! সবাই যে তাকে অবাক চোখে দেখছে, বুঝতে পেরে জোরে হাঁটা দেন বাড়ির দিকে। কলিং বেল বাজান।

—চোর চোর —বলে চেঁচাতে শুরু করেন মলি।

—আহ্, মলি! চেঁচিয়ো না। আমি তোমার দামু গো। তোমার স্বামী।

—অ্যাঁ! তা, তোমার এই বিচিত্র বেশ কেন? জানো না, আজকাল পিপিই কিট পরিয়ে, ভ্যাকসিন দেবার নাম করে টাকা নিয়ে যাচ্ছে!

—আহা, আমাকে ঘরে ঢুকতে দাও আগে, তারপর সব বলছি।

পিপিই কিট খুলে পাশে ঝুলিয়ে রেখে এবার লাক ভেক্সি লাকের মতো ঝোলা থেকে জিনিস বের করতে থাকেন। বিশাল স্যানেটাইজার, এক লিটার ডেটল, দু-পাতা প্যারাসিটামল, মাথা ব্যথার বাম, এক ডজন মাস্ক, হ্যান্ড ওয়াশের বড় বোতল, থার্মোমিটার, অক্সিমিটার, ওজন মাপার মেশিন ও সর্বশেষ তিনটি ছোট ছোট স্পঞ্জের পিলো।

—এসব কী? আমার মাসকাবারি জিনিস না এনে এইসব মাথামুণ্ডু তুমি কিনে এনেছ?

—আহা! আহা! চটে যাচ্ছ কেন? এই মাসকাবারি বাজার দিয়ে কী করবে? আগে প্রাণে বাঁচবে, তবে তো খাবে? তাই আগে বাঁচার রসদ আনলাম। কোভিডের বাবাও ঢুকতে পারবে না। বুঝলে গিন্নি?

—রাখ তোমার রসদ!

—এই যে ওজন মাপার মেশিন। একটু দাঁড়াও তো, দেখি তোমার ওজন কত?

—বাহ বাহ! ৭৫ দেখাচ্ছে। তোমার তো ৯০-এর নীচে নামেই না। এবার মলির মুখে হাসি ফোটে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দামোদরের। যাক, স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটেছে।

—এবার তুমি দাঁড়াও তো দেখি, তোমার ওজন কত? তা দামোদরবাবু গিন্নির কথামতো দাঁড়ালেন।

—ওমা! তোমার তো ৮০ দেখাচ্ছে? তোমার ওজন তো ৬০-এর বেশি হবার কথা নয়? তোমায় ঠকিয়ে পুরনো মাল চালিয়ে দিয়েছে। আর তুমি হাঁদারাম, তাই বাড়ি বয়ে নিয়ে এসেছ?

—আহা রাগ করছ কেন? তুমি তো শীতকালে চটি পরতে পারো না, পা স্লিপ করবে বলে। রান্নার ঘরে বড় ঠান্ডা। বরং ওটাতে দাঁড়িয়ে রুটি বানিও।

—মরণ! বলিহারি বুদ্ধি তোমার!

—এই যে এটার নাম অক্সিমিটার। কোনও দিন নাম শুনেছ? এটা দিয়ে শরীরের অক্সিজেন মাপতে হয়। আর অক্সিজেন লেভেল কমে গেলে, এই বালিশ তিনটে পায়ে, কোমরে, মাথার কাছে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লে আবার অক্সিজেন লেভেল ঠিক হয়ে যাবে।

—রাখো তুমি তোমার জিনিসপত্র! এইসব নিয়ে আজ থেকে তুমি নীচের ঘরে থাকবে, এই বলে দিলাম।

মহা ফ্যাসাদে পড়লেন দামোদরবাবু! ভেবেছিলেন, মলি বাহবা দেবে। কিন্তু বিধি বাম! অগত্যা নীচের ঘরের টেবিলে সব সাজিয়ে রাখলেন। রাত সাড়ে ন-টা নাগাদ ডাইনিং টেবিলে ঠকাস করে থালা রাখার শব্দ হল। বুঝলেন পারা চড়ে আছে। ওটাই খাবার ডাক।

কোনও মতে নাকে-মুখে গুঁজে ঘরে ঢুকলেন। মলি আগেই তার ঘরের লাইট বন্ধ করে দিয়েছে।

দামোদরবাবুর চোখে ঘুম নেই। ভাবলেন, একটু দেখবেন নাকি অক্সিজেন লেভেল? যেই ভাবা সেই কাজ। অক্সিজেন লেভেল ৯২ দেখাচ্ছে। তার মানে কম! যথারীতি তিনটে বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে আধা ঘণ্টা শোবার পর আবার দেখলেন ৯৬ হয়েছে। যাক, নিশ্চিত হওয়া গেল!

আজ তিনদিন হল ব্যাক্যালাপ বন্ধ! একা বিছানায় শোবার অভ্যাস চলে গিয়েছে বহুদিন!

রাতটা কেমন যেন আলুনি লাগে। রাতে চলে অক্সিজেন লেভেল মাপা। কাজেই ঘুমের দফারফা।

ভোরের দিকে চোখটা একটু বুজে এসেছিল। আলতো পায়ের আওয়াজে আধবোজা চোখে দেখলেন, মলি অক্সিমিটার আঙুলে দিয়ে দেখছে।

মনে মনে হাসলেন —ব্যামো ধরেছে! আর চিন্তা নেই। হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সকাল সকাল উঠেই হাঁকডাক —মলি চা করো।

—বলি এত হম্বিতম্বি কিসের? বেশ তো চলছিল। হাত-পা আছে বানিয়ে নাও। এবার মোক্ষম চাল দিলেন দামোদরবাবু।

—আচ্ছা মলি, তোমার যদি কোভিড হয়, কে দেখবে?

— কেন, তুমি আছ কী করতে? তুমি দেখবে।

—তার মানে, আমার কোভিড হলে তুমি দেখবে?

তাহলে তিনদিনের আড়ি আজ ভাব হয়ে গেল। ওই হাবিজাবি জিনিসগুলো নীচের ঘরে রইল। এবার থেকে তুমি আর আমি পাশাপাশি। তুমি আমার ফুলকো লুচি, আমি তোমার বেগুন ভাজা, কেমন?

—মরণ!

মুখ ঝামটা দেয় মলি। মুখে চাপা হাসি।

—রাধে! রাধে!

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে দামোদরবাবুর।

কবিতা

বিপ্লব

নির্মাল্য ঘোষ

বিপ্লবের প্রয়োজন আছে
বিপ্লব আসলে একটু একটু করে জমা
উত্তাপের বিস্ফোরণ
বিপ্লব ছাড়া শতাব্দী লালিত জড়
সংস্কারের বোঝা
কেউ সরাবে না
তাই, বিপ্লব জরুরি।
বিপ্লব ছাড়া এক লহমায় মরচে ধরা
নীতির পরিবর্তন সম্ভব নয়
সম্ভব নয় সাম্যের গীত গাওয়া
সম্ভব নয় জাতের নামে বজ্জাতি আর
ধর্মের নামে
অধর্মের নোংরামি মোছা
তাই, বিপ্লবের প্রয়োজন আছে
তাই, বিপ্লব ঘটে
ভিতরে ও বাইরে।

স্বপ্ন

অমিত দে

কাঠঠোকরার প্রাণপণ ঠুকে যাওয়া
আওয়াজ লিপিবদ্ধ করছে একটি
খসড়া-দুপুর

ভাঙা মাঠ স্বপ্ন-আল টেপাই জালে
আমাকে
বন্দি করেছে কাদাজলের বিবর্ণ ক্ষণিকে

বাঁশের দরমার দোচালা আকাশে উড়ে
গাইছে বিভক্ত দুটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত

পিয়ন বারবার এসে ডাকবাক্স পাচ্ছে না
হাতে লেখা চিঠিগুলো স্বপ্নে পুড়ে যায়...

ব্যবসার গারদ

রূপসা নাথ

পথভ্রান্ত পথিকের নির্ঘুম রাত,
বিশ্বজুড়ে দাবানল,
ঝুরঝুরে বাড়িঘর ভেঙ্গে পড়ে অবিরত,
পাতলা কাপড় ছাড়া
আর কিছু নেই ঢাল হিসেবে,
ক্ষতবিক্ষত লাশের টুকরো
ছিটকে পড়ে যত্রতত্র,
লোহার খাঁচায় বন্দীরা দাঁড়িয়ে মৃত্যুর
তামাশা দেখে চলে,
ভয়গুলো থিতিয়ে আসে ক্রমে,
নিভে যায় শেষ প্রদীপখানি,
ব্যবসার গারদ থেকে হবে না,
হবে না মুক্তি জানি।

মেঘবন্দিশ

অমিত পাল

কত বিরহের পর আজ ঝরে মন
শ্রাবণের দিন খুলে দিল তার ঝাঁপি।
কাছে এসে তুমি ছুঁয়ে দেখো একবার
সব মিলনের পরিণাম তবে পাপ-ই।

স্মৃতিদের আয়োজনে মান্দাস ভেলা
ভেসে যাবে শ্রাবণের মেঘবন্দিশে।
মিলেমিশে কোনদিকে জলকোলাহল
রাগে অনুরাগে হল আজ বন্দি সে।

সেই তবে কাছে আসা নীল ঘনঘোর
দুরুদুরু সলাজের মায়াদিন মেঘও।
প্রিয় মন হাওয়া চেনে দূর গলিপথ
ঝরে পড়া উপকূলে সাবধানে জেগো।

ঘেঁটে ঘ

আশ্বিনের শারদ প্রাতে
ছাতা সবার হাতে হাতে

পাঠিয়েছেন **মৌ দাশগুপ্ত**, আলিপুরদুয়ার

পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই

বৌ হারিয়েছে নিখিলের, ডায়ারি করছে সোনাদা?

সোনাদা থানায় গেছে একটা রিপোর্ট লেখাতে--

পুলিশ ঃ (ডায়ারি বের করে) আপনার কী অভিযোগ?

সোনাদা ঃ স্যর, আমার পাশের বাড়ির নিখিলের বৌ হারিয়ে গেছে। যেভাবেই হোক আপনি খুঁজে দিন, যেখান থেকে পারেন।

পুলিশ ঃ আপনার পাশের বাড়ির নিখিলের বৌ হারিয়েছে, নিখিল না এসে আপনি কেন রিপোর্ট লেখাতে এসেছেন?

সোনাদা ঃ স্যর, নিখিল দিনরাত বক্স বাজিয়ে আনন্দে নাচানাচি করছে। আমরা টিকতে পারছি না।

পাঠিয়েছেন **সত্যবান মিত্র**, শিলিগুড়ি

টই টই

ঈশ্বর যেখানে পেতেছেন সবুজের শয্যা

নদীর বুকচিরে বয়ে যাওয়া জলরাশির দিকে তাকিয়ে পৌঁছতে পারেন স্বপ্নের দেশে। একাত্ম হতে পারেন প্রকৃতির সঙ্গে।

রূপন সরকার

রাজাভাতখাওয়াকে পূর্ব ডুয়ার্সের বন-প্রশাসনের রাজধানী বলা চলে। তার চারপাশে নানা উপগ্রহ সদৃশ বন-প্রশাসনের কেন্দ্র। রয়েছে দমনপুর, পাড়ো, নিমাতি, পানা, বক্সা, মেন্দাবাড়ি, রায়ঢাক, রায়মাটাং সহ একাধিক প্রশাসনিক কেন্দ্র। যার সবটাই আলিপুর ডিভিশনের অধীন। কি বিচিত্র এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য! এপাশে-ওপাশে অরণ্যভূমি, নদী-ঝোরা, বাহারি ফুল, পাখির কিচিরমিচির, নেপালি, বাঙালি, সাঁওতাল, রাজবংশী পুরুষ-রমণীর যাওয়া-আসা। রাজাভাতখাওয়াকে কেন্দ্র করে রয়েছে একাধিক 'ভ্রমণ ডেস্টিনেশন'।

জয়ন্তী, ২৮-বস্তি, সান্তালাবাড়ি, বক্সা, লেপচাখা, ভুটানঘাট, রায়মাটাং, রায়ঢাক বনবাংলো ও সবুজের চাদরে মোড়া অসংখ্য সমৃদ্ধ চা-বাগান। চা-বাগানগুলোর ঐতিহ্য ও স্থাপত্য এতদঞ্চলে ইংরেজদের পদচারণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত রাজাভাতখাওয়া জনপদটিও যথেষ্ট সুন্দর। বনবেষ্টিত এই ছোট্ট জনপদটিকে ঐশ্বরিক সৌন্দর্য দান করেছে এর বুক চিরে বয়ে যাওয়া চৈতন্য ঝোরা। জয়ন্তী ফরেস্ট গেটের পূর্বদিক থেকে একটি সরু অথচ চির যৌবনা জলধারা বেরিয়ে এসেছে। সেটি রাজাভাতখাওয়া রেল ট্রেকের পশ্চিম দিক থেকে রেল ট্রেকের নীচ দিয়ে বেরিয়ে আসা অন্য একটি ঝোরার সঙ্গে রেল স্টেশনের পূর্ব-পশ্চিম দিকে মিলিত হয়ে চৈতন্য ঝোরার পরিচয় বহন করেছে। তারপর এঁকেবেঁকে অজগর সাপের মতো

রাজাভাতখাওয়া জনপদকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। সারাবছর জল থাকা এই চৈতন্য ঝোরার স্বচ্ছ, নীল, নিটোল জল দেখলে এমন কোনও মানুষ নেই, যার জলে নামতে ইচ্ছে করবে না। রাজাভাতখাওয়া রেল স্টেশনের কাছে নদী স্রোত, স্থলপথ, রেলপথ সমান্তরালভাবে প্রবাহিত, যা অধিকাংশ ভ্রমণ পিপাসু এমনকি স্থানীয় মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। ভুটান পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ঐতিহ্যবাহী রেল স্টেশনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকা যায়। বৃষ্টিস্নাত রাজাভাতখাওয়া জনপদের চারপাশ সবুজে আবৃত থাকে। পাশ দিয়ে বয়ে চলা ডিমা নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগও রয়েছে রাজাভাতখাওয়া থেকে। এখানে আছে তিন-তিনটি নার্সারি। একটি রেল স্টেশনের পশ্চিম দিকে ফরেস্ট পাড়াতে, দ্বিতীয়টি আলিপুরদুয়ারগামী রাস্তার পূর্বপ্রান্তে মিউজিয়ামের পাশে এবং তৃতীয়টি রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকায়।

আমাদের মধ্যে যে সমস্ত মানুষ প্রাতঃভ্রমণে অভ্যস্ত তাদের জন্য রাজাভাতখাওয়া হতে পারে অন্যতম স্বাস্থ্য উদ্ধার কেন্দ্র। ভোরবেলা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়াম সংলগ্ন বনবেষ্টিত, কাঠের সারিবদ্ধ কোয়ার্টারে ঘেরা মাঠে শরীরচর্চা করার সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত নয়। এমন প্রাকৃতিক দৃশ্যসম্ভার সমগ্র বাংলার খুব কম জনপদেই আছে। তবে ডুয়ার্সের অন্যান্য অঞ্চলের মতই রাজাভাতখাওয়ার সৌন্দর্যের ব্যবসায়ীকরণ এখনও পর্যন্ত হয়নি বললেই চলে।

রাজাভাতখাওয়ার অনতিদূরেই রয়েছে পূর্ব ডুয়ার্সের অন্যতম 'ভ্রমণ ডেস্টিনেশন' জয়ন্তী। রাজাভাতখাওয়া মিউজিয়ামের পাশে বন দপ্তরের অফিস থেকে জনপ্রতি ২০০ টাকার (কম-বেশি) বিনিময়ে অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে যে কোনও ধরনের গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ুন। সবুজে ঘেরা কালো পিচের রাস্তা ধরে মাত্র নয় কিলোমিটারের পথ। তারপরই পৌঁছে যাওয়া জয়ন্তী নদীবক্ষে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে যাত্রাপথের এই সাত থেকে নয় কিলোমিটার পথিমধ্যে দেখা পেলেও পাওয়া যেতে পারেন নানা রকম বন্যপ্রাণী। জয়ন্তী নদীর পূর্বদিকে রয়েছে ভুটান পাহাড় আর পশ্চিমপ্রান্তে নদীধার ধরে রয়েছে সরকারি, বেসরকারি অতিথিশালা সহ ছোট-বড় নানা কটেজ এবং হোমস্টে। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলে পাহাড়ি নদীর কলকল কোলাহল। সুলভ থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত আছে এই সমস্ত অতিথিশালাগুলোতে। জয়ন্তীতে পৌঁছে এই সমস্ত অতিথিশালায় উঠে খানিক জিরিয়ে নেবার পর বেরিয়ে যাওয়া যেতে পারে জঙ্গল সাফারিতে। পৌঁছতে পারেন জয়ন্তী ওয়াচ টাওয়ারে। দেখা মিললেও মিলতে পারে নানা রকম বন্যপ্রাণী ও পাখিদের সমাবেশ। এরপর প্রায় ১০০ মিটার ট্রেক করে উপরে উঠে উপভোগ করতে পারেন পুখরি লেখ-এর সৌন্দর্য।

পুখরি মানে পবিত্র, পবিত্র হ্রদ। স্থানীয় মানুষেরা এই হ্রদকে পবিত্র বলে মানেন ও পুজো করেন। তাই হ্রদের কোনও মাছই ধরা মানা। জয়ন্তী নদীর কিছুটা উপরে রয়েছে মহাকাল। পাহাড়ের ভি-আকৃতির উপত্যকায় অবস্থিত মহাকাল মন্দিরের সৌন্দর্যই আলাদা। মহাকাল দর্শন করে ফের রিসর্টে ফেরা। নীরবতা আলিঙ্গন করে রিসর্টের ব্যালকনিতে বসে জ্যোৎস্না নেমে আসা জয়ন্তী নদীর বুকচিরে বয়ে যাওয়া জলরাশির দিকে তাকিয়ে পৌঁছতে পারেন স্বপ্নের দেশে। একাত্ম হতে পারেন প্রকৃতির সঙ্গে।

ইচ্ছেডানা

ঐশিকা বিশ্বাস, দ্বিতীয় শ্রেণি, পান্ডাপাড়া সারদা শিশুতীর্থ

সুমি হালদার, সপ্তম শ্রেণি, বাঁশবাড়ি কৃষ্ণমোহন বালিকা বিদ্যালয়

পার্থিব সোম, দ্বিতীয় শ্রেণি, ড্যাফোডিলস ইংলিশ অ্যাকাডেমি

লেখা পাঠান: ছোটগল্প (১২০০ শব্দ), রম্যরচনা (৫০০ শব্দ), নিবন্ধ (১০০০ শব্দ), কবিতা (১২ লাইন), বড়চর্চা (২৫০ শব্দ), পাচ্ছে হাসি (৫টি জোক)। বিভাগ উল্লেখ করে নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার মধ্যে (ইউনিকোডে)
লেখা পাঠান rongdarrobbar@gmail.com **ছোটরা, নাম-বিদ্যালয়-শ্রেণি সহ আঁকা-লেখা পাঠাও** ichchhedanaubs@gmail.com ডাকযোগে: **রংদার রোববার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৪এ মনোহরপুকুর রোড, কলকাতা-২৬।**